বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস ই সি -টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :-বলাকা কাব্যের বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীর নাম :- শ্রাবনী জানা

সেমিস্টার :-চতুর্থ

পত্র -এস ই সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং -২১১০৪০২৪৪,২০২১-২০২২

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০২১

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014
At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650
www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that ---Shraboni Jana--- Roll: 1114152--- No: 210021 Reg.No:- ------------------- of -------------------, a student of B.A. 4th Semester (Honours). Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/he. project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

....
Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad ... Pin-721650

....
Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

....
Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

সূচিপত্র

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সু-পরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদনা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

★ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :—

i) সমস্যাকেন্দ্রিক :-

প্রকল্প হল সমস্যাকেন্দ্রিক অর্থাৎ, কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ii) উদ্দেশ্যভিত্তিক :-

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

iii) সৃজনশীলতা :-

প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

iv) অভিনবত্ব :-

প্রকল্পমূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কাজের মধ্য দিয়ে অভিনবত্ব দেখা যায়।

v) অনুসন্ধানমূলক কাজ :-

প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর নানারকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে যেতে।

vi) শিশুকেন্দ্রিকতা :-

প্রকল্প ভিত্তি যাতে সর্বদা যেনো না কোনো শিশুর চাহিদাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

vii) প্রকল্প সংক্রান্ত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

(ঘ) প্রকল্প কয়প্রকার ও কী কী?

প্রকল্প সাধারণত দুপ্রকার। যথা:- (i) একক প্রকল্প
ii) দলগত প্রকল্প

(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

=> প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল:-

i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আনন্দমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা। মানসিক বিকাশ সাধন করা।

ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

(ঘ) প্রকল্পমূলক কাজের উপকারিতা কী?

i) প্রকল্প রূপায়নের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।

iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

(ঙ) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিটি দেশে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক অগ্রগতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তার-ই অঙ্গ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যহত থাকে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' এই কাব্যে কবির অনুভূতিতে গতির সুর অনুভব করা যায়। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি ও বস্তুর মধ্যে গতির ক্রিয়ার কথা বলেছেন, 'বলাকা'য় কবি এই নতুন ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি লক্ষ করা যায়। 'ছবি', 'চঞ্চলা', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে। যৌবনের জয়গান করেছেন - 'সবুজের অভিযান', 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি কবিতায়। অজানার লীলা রহস্যের অনুভূতির কথা জানতে পারি 'প্রেমের পরশ' 'তুমি- আমি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় গতি বন্দের কথাই বার - বার ধ্বনিত হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলির উপর গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য আমি বলাকা কাব্যের বিশেষ বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকার' বিশেষত্ব :-

ভূমিকা:- বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রতিভা। কাব্য সাধনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যের নানাদিকে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই, চিন্তার এমন কোনো শাখা নেই যা নতুন নতুন সৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ বা আলোকিত হয়ে ওঠেনি। কবিতা গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, সংগীত, নৃত্যনাট্য, চিঠিপত্র প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নতুন নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের আত্মমর্যাদা ও সুস্থ জীবনচেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর সমস্ত লেখায়। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাত্মভাবনায় পর্যালোচনা করলে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'বলাকা', 'পলাতকা' প্রভৃতি অজস্র কাব্য জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায়। পর্বগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) সূচনাপর্ব (১৮৭১ – ১৮৮১) খ্রিঃ

এই পর্বের রচনাগুলি হল :—
'বনফুল' (১৮৭২)
'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)
'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১)
প্রভৃতি।

এই পর্বের কবিতায় বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, প্রমুখ কবির রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

২. উন্মেষ পর্ব (১৮৮২ – ১৮৮৬) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :- 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) খ্রি:
'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩)
'ছবি ও গান' (১৮৮৪)
'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)
প্রভৃতি।

৩. ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৯০ – ১৮৯৬) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :– 'মানসী' (১৮৯০) খ্রি:
'সোনার তরী' (১৮৯৪)
'চিত্রা' 'চৈতালি' (১৮৯৬) প্রভৃতি।

৪. অন্তর্বর্তী পর্ব (১৯০০ – ১৯১০) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :– 'কথা' (১৯০০) খ্রি:
'নৈবেদ্য' (১৯০২)
'স্মরণ' (১৯০৩)
'খেয়া' (১৯১০)

৫. গীতাঞ্জলি পর্ব (১৯১০ – ১৯১৫) খ্রি:

এইপর্বের রচনাগুলি হল :– 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) খ্রি:
'গীতিমাল্য' (১৯১৪)
'গীতালি' (১৯১৫)

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অতীন্দ্রিয়তার প্রকাশ ঘটেছে।

৬. বলাকা পর্ব (১৯১৬ – ১৯২৯) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :- "বলাকা" (১৯১৬) খ্রি:
"পলাতকা" "শিশু ভোলানাথ" (১৯২২)
"পূরবী" (১৯২৫) "মহুয়া" (১৯২৯) খ্রি:
প্রভৃতি।

এই পর্বে মুক্তক ছন্দে কবির গতিতত্ত্ব ও যৌবনতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

৭. পুনশ্চ পর্ব বা গদ্যকবিতার পর্ব (১৯২৯ – ১৯৩৬) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :- "পুনশ্চ"
"শেষসপ্তক"
"পত্রপুট"
"পরিশেষ"
"শ্যামলী" প্রভৃতি।

৮. অন্ত্যপর্ব (১৯৩৬ – ১৯৪১) খ্রি:

এটি রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থের শেষপর্ব। এই পর্বের রচনাগুলি হল :—
"প্রান্তিক" (১৯৩৮) খ্রি:
"আকাশপ্রদীপ" (১৯৩৯) খ্রি:
"নবজাতক" (১৯৪০)
"আরোগ্য" (১৯৪১)
"সানাই" (১৯৪০)
"সেঁজুতি" (১৯৩৮)
"রোগশয্যায়" (১৯৪০)
"জন্মদিনে" (১৯৪১) প্রভৃতি। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা। জীবনসায়াহ্নে উপনীত কবির জীবন, মৃত্যু ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন।

☐ 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। 'বলাকা' ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম, আধ্যাত্মিক ভাবনা, মৃত্যুচেতনা, জীবনদেবতা, গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মনের তুলিতে সুনিপুণ হাতে এঁকেছেন। তাই বলা যায়, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম।

'বলাকার পরবর্তীকালে কবির মানসিকতা :-

রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ অতি পরিণতি ধীর প্রকৃতি। গাছ যেমন ধীরে ধীরে বাড়ে, ফুলে-ফলে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণতিও তেমনি ও ধীর। একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তিনি সবাইকে চমকে দেননি। প্রকৃতির নিয়মে তিনি ধীরে ধীরে যে প্রতিভার বিকাশ বিস্তার লাভ করে। শেষপর্যন্ত তিনি ফুলে-ফলে নিজেকে বিকশিত করে নেছেন।

☐ যে বৃহত্তর জীবনের প্রত্যাশায় 'প্রভাতসংগীত' রচনা করেছিলেন, সেই জীবনের মধ্যে কবিমনের নির্দিষ্ট পরিচয় ধীরে ধীরে গুঞ্জরণ- 'ছবি ও গানের' মধ্য দিয়ে. এর কিছুদিন আগে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে এসে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে একটি কাব্য নাটিকা রচনা করেছিলেন, 'ছবি ও গান' ও ঠিক এই কালের রেখায় টানা ছবি। এই রচনাগুলি আরম্ভ হয়েছিল কারোয়ারের সমুদ্রতীরেই।

◻ 'ছবি ও গানের' অধিকাংশ কবিতা কবি বাইরে যা কিছু দেখেছি তা কথার রেখায় ধরে এক-একটি ছবি রচনার চেষ্টা, কবির নতুন জাগ্রত চৈতন্যের প্রথম চিত্রলিপি। প্রকৃতিকে দেখার ভঙ্গিমায় নতুনত্ব নয়, ছন্দকৌশলের দিক থেকে কবি নতুন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। একটা উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। তেইশ বছর বয়সে প্রমথ চৌধুরীর কাছে একটি পত্রে 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে লিখেছিলেন:—

"আমার 'ছবি ও গান' আমি কী পাগল হয়ে লিখেছিলাম। তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভব করেছ। আমি দিনরাত পাগল হয়েছিলাম।

আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। ----- কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণামের কিছু ছিল না। ------ সত্যি কথা বলতে কি; সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না", -----

◻ কবি চিরকাল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু সে যৌবন প্রবাহিত বাসনাহীন। সেই যৌবনের পরিচয় পাই — 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে 'চিত্রা' পর্যন্ত। কোন সুখ হোক, দুঃখ হোক কোনো ভাবনা ও অনুভূতি কবিকে দীর্ঘদিন বেঁধে রাখতে পারে না। তিনি যে তা ভুলে যান তা নয়, কিন্তু তাঁর কবিতার

তাকে অতিক্রম করে যায়। কবি-জীবনে কোন অবস্থাতেই চরম-পরম বলে স্বীকার করেন না। উত্তর জীবনেও মৃত্যুলোক বার-বার কবির জীবনে আঘাত করেছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিতে বার বার জীবনে টেনে ফেলে দিতে চেয়েছেন। "কড়ি ও কোমল" সেইজন্য জীবনের বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তরজীবনে কবি 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি'-তে আমরা দেখি কবির প্রশান্ত রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি কবিমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ অভিসারের পর বার-বার তিনি সৌন্দর্যের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে দেহভোগাকাঙ্ক্ষাতে বড়ো সৌন্দর্য ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছেন। বস্তুদেহ ও ভাবদেহের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দিক 'কড়ি ও কোমল' অন্য কয়েকটি কবিতাতে দেখা যায়। কবির চির-বিরহীমন ব্যাকুলতার বন্ধনে পূর্ণ মিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থেকে যায়। একটা উদাসীন যেন কবিমনকে ভোগকান্ত করে রাখে বাসনার ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে চান। কবির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়, লাভ ঘটল 'মানসী'তে। 'মানসী'তে তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তাঁর উজ্জ্বল কবি প্রতিভার সৃষ্টি প্রকাশ করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি তা এই সময় থেকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করল। 'মানসী' নিসর্গ সম্পর্কীয় কবিতাগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি এবং অপূর্ব ছন্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতায় যে চিন্তার গভীরতা, মনের উন্মুক্ত প্রসার এবং যে সবল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখতে পাওয়া যায়

তা পূর্ববর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না। এবং পরবর্তীকালে 'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'চৈতালী' 'কল্পনা' প্রভৃতি কবিতাতেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সঞ্চিত হয়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের জীবনের রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণতা ও বিস্ময়গুলি ধরা পড়েছে।

★ 'গীতাঞ্জলি' পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতা :-

'খেয়া' তে কবির এক নতুন জন্মান্তরের সূচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু শুধু ভাবের জগতেই কবি জন্মান্তর করেছেন এমন নয়, সুরের জগতেও কবির জন্মান্তর ঘটেছে। 'খেয়া'র পর কবি এই সুরের জগতের সৃষ্টি হল। সুদীর্ঘ বছরের পর বছর কবি সুরের রাজ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। যে কবিকে আমরা গম্ভীর শুনেছি জ্ঞানলাভের কথা, যাকে দেখেছি উর্বশীর সৌন্দর্য্য নয়ন ও মন ভরে উপভোগ করতে, পৃথিবীর সুবিস্তৃত বুকে নিজেকে বিস্তারিত করতে, জীবনের দৃপ্ত জয় মহিমা প্রচার করেছে, কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মত্ততায় নাচতে, সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্য মিলিত কবিমনের আজ কী হল? বিরাট এক অন্তহীন গভীর প্রেম ও আবেগ কবি মনকে আকর্ষণ করল। তার ফলে, সমস্ত দেহ, মন, কল্পনা বাঁশির মতো বেজে উঠতে লাগল। কবির সমস্ত বল যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল বুদ্ধির যত ঔজ্জ্বল্য, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার প্রবল উদ্দীপনা! সমস্ত অলংকার যেন একমুহূর্তে খসে পড়ল। সমস্ত বাহুল্য অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি যেন তাঁর হৃদয়কে একেবারে ঢেকে না রেখে দেবতার সামনে অঞ্জলি দেবার মতো তুলে ধরলেন।

যে কয়েকটি কথা সুরের রূপ ধরে মন বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো তা একান্তই সহজ ও সরল।

☐ 'সোনারতরী' - 'চিত্রা' 'কল্পনার - অনির্বাণ কবি', মানব ও প্রকৃতির কবি, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' - গীতালি তে এক ভিন্ন স্বাদের পর অধ্যাত্মজীবনের দুইগ্রন্থ লাভ করেছেন। তা কিন্তু আকস্মিক ব্যাপার নয়। সৌন্দর্য - মাধুর্য - প্রেম-আনন্দ সকল রসের মধ্যে যিনি এতদিন ডুবে ছিলেন তিনি যে প্রেম সৌন্দর্য মাধুর্যকে পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন, সকল রসের মূলে পৌঁছতে চাইবেন, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টা 'খেয়া' থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু 'গীতালি'-তে স্পষ্ট রূপ ধারণ করল, পরিণতি সাধ্যতলী প্রেম 'গীতিমাল্যে'। কিন্তু নিসর্গ - প্রকৃতির গান এবং আরও কয়েকটি গান ও কবিতা ছেড়ে দিলে। 'গীতাঞ্জলির' প্রত্যেকটি গানে তাদের সুর-রস স্বরূপ পাবার জন্য সাধিকের কী আকুলতা, সর্বত্র তাঁর অভিব্যক্তিতে অনুভব করার জন্য কি তীব্র আবেগ, নিজের সকল অহংকার ভেঙে জীবন কুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করার প্রাণপাত নিবেদন করেছে। 'গীতাঞ্জলি' তে এই অতীন্দ্রিয়চেতনার কবিমনের সহজ, সরল, উপলব্ধি সুন্দর লীলার কোন আভাস আমরা পাই না। পাই সাধনার বেদনা ও তার বিভিন্ন সুর, পাই সংগ্রামের আভাস, পাই ব্যর্থতার ও বিরহের অস্পষ্ট ক্রন্দন। আর যতদিন পর্যন্ত জীবনের এই সাধনার আনন্দ সহজ হয়ে উঠল না, উপলব্ধি সরল হল না, ততদিন সৌন্দর্য অনুভূতি কবি কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারলেন না।

সেই তৃপ্তি ও শান্তি, আরাম ও আনন্দ লাভ হল 'গীতিমাল্যে'। অধ্যাত্ম জীবনের সার্থক প্রকাশের দিক থেকে 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' 'গীতাঞ্জলির' শ্রেষ্ঠ একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

☐ 'গীতাঞ্জলি' — 'গীতিমাল্য' — 'গীতালি' এই গ্রন্থ কয়েকটির প্রায় সবকটিতেই গান, 'খেয়া' গ্রন্থে আমরা জেনেছি যে কবির উন্মুখ কবিমনের অধীর অপেক্ষা। 'গীতাঞ্জলি'তে দেখেছি উন্মুখ অধীর অপেক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরে - গুমরে উঠেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে সত্য ভাবে পাওয়ার দুঃখ গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর গভীর ছায়া ফেলেছে। নানা অবস্থা, পরিবেশের মধ্যে কবি নানান দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন। নানাভাবে কবি তাকে পেতে চেয়েছেন। কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হল না। সেইজন্যই একটা কান্না - বেদনার সুর 'গীতাঞ্জলির' তারের গানেই লক্ষ্য করা যায়। দুঃখ - আঘাত - বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কবি যে সাধনা সে সাধনাকে কবি স্বীকার করেছেন। এবং সেই সাধনার মধ্য দিয়ে তা উত্তীর্ণ করে তিনি দেবতার স্পর্শ পেতে চেয়েছেন। দুঃখ, আঘাত, বেদনা, সে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি কবিমনে জেগে উঠেছে। আবার নিজের অহংকারকে ভেঙে ফেলার যে সাধনা সেই সাধনাকেও কবি স্বীকার করেছেন। এবং নিজের সব অহংকারকেও চোখের জলে ডুবিয়ে দেবার সাধনা অভ্যাস করেছেন। আবার, কর্মযোগের যে সাধনা তাও কবি স্বীকার না করে পারেননি, এ কথা তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। আমাদের দেশে যিনি সুউচ্চ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন,

সবার পিছনে, সবার নীচে, সর্বহারাদের মাঝে। কবি সেই ভিখারিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি' গানগুলিতে তাই দেখি দীন, কবির এই মহিমার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহিমার পরিপূর্ণ প্রকাশ যে এক সময় তা 'গীতাঞ্জলি'তে নেই আগে চলে। 'নৈবেদ্য'-র 'গীতাঞ্জলি' অধিকাংশ গান ও কবিতা বাগাড়ম্বর হতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এই কথা সত্য, গীতাঞ্জলি অধিকাংশ গানে বলেছে কথা অপেক্ষা, মহিমার কথা বেশি। আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।

'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতা :-

'গীতাঞ্জলি' পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন কাব্য সৃষ্টির সম্ভাবনা হল। সেটি হল — 'বলাকা'। ১৩২১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসের মধ্যে 'গীতিমাল্য' শেষ হল। 'গীতালি'র সবগুলি গান ও কবিতা আষাঢ় থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে রচিত। 'গীতাঞ্জলি' — 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র কবি, হঠাৎ 'বলাকা'য় নতুন ছন্দলোক রচলেন, তা বাস্তবে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

মানুষ সাধারণত সুখ, দুঃখ, আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। যখন কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে শান্তিলাভ করতে পারে না। তখন সে ভগবানকে একান্তে আশ্রয় ভেবে তাঁতেই আত্ম সমর্পণ করে। এবং তার সঙ্গে মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা করে না। এটি সাধারণ মানুষের কথা, তবে কবি জীবনেও তাই ঘটে থাকে। আমরা হয়ত ভেবেছিলাম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' তিনটি কাব্যেই আত্মনিমজ্জন করে ঈশ্বরের চরণে কবি

নিজেকে নিবেদন করে, কবিমনের শেষ আশ্রয় হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তা হল না। কারণ তিনি তো চিরচঞ্চল; তাঁর চির পথিক কবিমন কোন নির্দিষ্ট ভাবক্ষেত্রে আটকে রাখতে পারেননি। নতুন-নতুন ভাবের জন্য উপলব্ধি করার জন্য আকুল ভাবনা যে কবিকে পাগল করে তোলে। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটা সহজ-স্বচ্ছ আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দ ক্ষেত্র তাঁকে কোনমতেই বেঁধে রাখতে পারেনি। 'গীতিমাল্যে'র শেষের দিকে এবং 'গীতালি'তে অতীন্দ্রিয় কাব্যানুভূতি কে ছেড়ে মাঝে মাঝে প্রবাসে গেছে। মানবপ্রীতি ও নিসর্গ সৌন্দর্য প্রেরণা; 'গীতালি'র শেষের দিকে আমরা দেখেছি এগিয়ে চলার আহ্বান কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। এই

এইসময় হঠাৎ কবির 'বলাকায়' নবজন্ম লাভ ঘটল। এবং পুরোনো পৃথিবীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছবিকে নতুন উদ্ভাবে ধীরে ধীরে 'পুনর্জন্ম' লাভ করার চেষ্টাও দেখা দিয়েছে। 'বলাকা' গতিবাদের কাব্য। এই গতিবাদ কবিকে মুগ্ধ করে। কবিমনের এক নতুন ভিন্ন স্বাদের অনুভূতি জেগে উঠল। তাই 'বলাকায়' এই গতিতত্ত্ব কখনো আপাত দৃষ্টিতে স্থির বস্তুকে কেন্দ্র করে (ছবি, তাজমহল), আবার কখনো চঞ্চল বস্তুকে কেন্দ্র করে (চঞ্চলা, 'বলাকা')। এই গতিতত্ত্ব মিলে মিশে এসেছে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে যৌবনের জয়গান। আবার, এই কবিতায় রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। যে কবিতাগুলি রবীন্দ্রযুগের সৌন্দর্য, সহজ-সরল-অনুভূতিতে সার্থক ও অন্তর রহস্যের সুনিবিড়তা 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র অধ্যাত্মভাবনার শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সমান।

'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্যের রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা শুধু ভাবের ক্ষেত্রে পৃথক নয়, কলাকৌশলেও পৃথক। 'বলাকা'র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, উদ্দাম বেগে কালস্রোত ছুটে চলেছে। যেন নিজের কী জোয়ারে মতো চিরাই নদী। তার যৌবন যেন ফিরে এসেছে তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। মানুষের শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলোর ভিতর ও বাইরের অনেক অমর ভিত্তি। তিনেক দুঃ গভীর রহস্য ইতিমধ্যে কবিচিত্তের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল। 'বলাকায়' প্রায় সকল কবিতাতেই প্রেম - যৌবন - সৌন্দর্য ও জীবন গতিবেগের প্রবাহের কথাই কে তুলে ধরেছেন। 'বলাকার' বিভিন্ন কবিতায়।

— o —

বলাকার জন্মকথা :-

'বলাকা' কাব্যটি গতিবাদের কাব্য। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন-ই গতির উপাসক ছিলেন। এ কথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি। ১৯১২ সালে তাঁর 'ডাকঘর' ও 'অচলায়তন' বের হল। তারপর তিনি নানাদেশে ভ্রমণ করলেন ও নানাদেশের মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। গীতাঞ্জলির প্রচার হল ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। তারপর প্রমথচৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজপত্র' বের হল। তাতে রবীন্দ্রনাথ পুনরুত্থান ও গতিতত্ত্ব ঘোষণা করলেন। ঐই সময়েই 'বলাকা'র কবিতা গুলি একে একে জন্ম করতে আরম্ভ করল। অবশেষে ১৯১৬ সালে 'বলাকা' ছাপা হয়।

সেইসময় কবি 'সবুজপত্রে' কয়েকটি কবিতা লিখতে ও শুরু করলেন। প্রথম কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লেখা (১৫ই বৈশাখ ১৩২১)। কয়েকদিন পর পুত্রবধূ ও কন্যাকে নিয়ে কবি রামগড় পর্বতে গেলেন। সেখানে আনন্দ উৎসবের মধ্যে কবিমনের একটা বেদনা। রামগড়ে (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতাটি লেখা। এরপর য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এল। তখনই বোঝা গেল কবির মনে তার-ই পরাভাস বেদনার খবর এল। তখনই বোঝা গেল কবির মনে তারই পূর্বাভাস বেদনা রূপে জেগেছিল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ তৃতীয় কবিতাটি লিখেছেলেন। ১২-ই জ্যৈষ্ঠ লিখেছেলেন চতুর্থ কবিতাটি। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে অশান্তি ও বেদনার শেষ। তাঁর কবিতাগুলি প্রায় বোঝা যায়। যুদ্ধের কারণে কবির মনে ঐ বেদনা।

আরও কয়েকদিন পর, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার আগেই, রবীন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে গ্রীষ্মশেষে বিদ্যালয় খুলে যাওয়ায়, কলকাতা থেকে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। 'বলাকা' কবিতা কিছুদিন বন্ধ থাকল।

১৩২১ সালে ৫ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যান। ঐ ৫ই ভাদ্র কলকাতায় ৫নং কবিতাটি লেখা হল। তারপর কার্তিক মাস পর্যন্ত 'বলাকার' আর কোন কবিতা লেখা হয়নি।

এরপর কবি এলাহাবাদে ২৯ শে আশ্বিন 'গীতালি'র দুটি গান রচনা করলেন। 'গীতালি' সবটাই এলাহাবাদে লেখা। ৩রা কার্তিক 'গীতালি'র শেষ কবিতাটি লিখে কবি 'বলাকা'র ৬নং কবিতাটি লিখেছিলেন। ঐ কবিতাটি হল 'ছবি'। এখানেই ১৫ই কার্তিক কবি 'বলাকা'য় ৭নং কবিতা 'শাজাহান' কবিতাটি লেখেন।

অগ্রহায়ণে কবি আগ্রা গেলেন। আগ্রা থেকে এলাহাবাদে ফিরে 'বলাকার' কয়েকটি কবিতা লেখেন। ৮নং কবিতাটি ('চঞ্চলা') এলাহাবাদে ৩রা পৌষ লেখা। ৯ নং কবিতা ও ৫-ই পৌষ এলাহাবাদে লেখা। ১০ ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'বলাকার' ১০ নং কবিতা লিখলেন। ১২-ই পৌষ ১১নং এবং ১৩ই পৌষ ১২নং কবিতা তিনি শান্তিনিকেতনে লিখলেন। ১৩ নং কবিতাটি ২৩ শে পৌষ স্কুলে বসে লেখা। ডাকঘরে পৌষ আশ্রমে শান্তিনিকেতনে ১৪ নং কবিতাটি লিখলেন। ১৫নং ও ১৬ নং কবিতা দুটি পৌষ শ্রীনিকেতনে লেখা হল। ১৮নং ও ১৯ নং শ্রীনিকেতনেই পৌষ প্রভাতকালে রচনা হল।

ঐ কবিতাটি লেখার পর কবি মাঘোৎসবের জন্য কলকাতা পথে ট্রেনে বসে ২০ নং কবিতাটি লিখেছেন। কলকাতা পৌঁছে ও মাঘোৎসবের ব্যস্ততায় সেই আনন্দ প্রকাশ করার সময় পেলেন না। ৮ই মাঘ তিনি ২১ নং কবিতায় তাঁর সেই আনন্দটিকে রূপ দিলেন।

আঠারো-ই মাঘ শিলাইদহে নির্জন পদ্মাতীরে গিয়ে কবি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। উনিশে মাঘ ২২নং এবং বিশে মাঘ ২৩ নং, ২৪নং, ২৫নং ও ২৬ নং কবিতাটি লিখলেন। বাইশে মাঘ ২৭ নং, চব্বিশে মাঘ ২৮নং, পঁচিশে মাঘ ২৯নং, ছাব্বিশে মাঘ ৩০ নং, সাতাশে মাঘ ৩১নং কবিতা, ৩২নং ও ৩৩নং কবিতা রচনা করলেন। এতেই বোঝা যায় কবির মনের মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীকে আহ্বানে ঠিক আগের অবস্থাটি পেয়েছিলেন। নয়দিনের মধ্যে এতগুলি কবিতা লেখাতে সহজেই

১০ই ফাল্গুন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসে কবি সকালে সুরুল (শ্রীনিকেতনে) চলে গেলেন। সেখানে কবি ফাল্গুনী নাটক লেখা শেষ করে, ২০ শে ফাল্গুন তা আশ্রমের সকলের কাছে পাঠ করে শোনান।

তারপরেই ২০ শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল আশ্রমে যান। কবির সঙ্গে তার দেখা হয়। ১৪ ই চৈত্র কবি কলকাতা যান। এই সব ব্যস্ততায় কবির 'বলাকা'র কবিতা লেখা হল না। কলকাতা থেকে এসে ২১ শে চৈত্র সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) তিনি ৩৪ নং কবিতাটি লেখেন। ইতিমধ্যে 'ফাল্গুনী'র গান, সুর, নিয়ে কবি খুবই ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে এল বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব। এরপর কবি কলকাতায় যান। নানাকারণে কবির মনে নানা দুশ্চিন্তা দি

২৪শে শ্রাবণ কবি আশ্রমে ফিরলেন। বর্ষার পর শারদোৎসবের জন্য কবি ছেলেদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। এইসব নানাকারণে 'বলাকা'র কবিতা আর লেখা হচ্ছিল না। ইতিমধ্যে কাশ্মীর যাবার নিমন্ত্রণ এল।

□ পুত্র, পুত্রবধূ ও কবি সত্যেন্দ্র দত্তকে নিয়ে কবি কাশ্মীর গেলেন। এবং বহুদিন পর ১৩২২ সালে ৭ই কার্তিক 'বলাকা'র ৩৫নং কবিতা শ্রীনগরে লেখা হল। ২১শে উত্তরের পর ঐ কবিতার জন্ম। তারপরের কবিতা হল 'বলাকা' (৩৬)। যা কয়েকদিন পরে শ্রীনগরে লেখা। শ্রীনগরে ঝিলাম নদীর সুউচ্চ বালুরাশির উপর দিয়ে একদল বলাকা উড়ে গেল। তাকালে এই অপূর্ব কবিতার উদয় হল। এই কবিতার নামেই বইয়ের নাম হল - 'বলাকা'। এবং কবিতাটি ও ২৩শে কার্তিক এখানেই লেখা।

□ কাশ্মীর থেকে এসে কবি শিলাইদহ গেলেন। সেখানে পদ্মা বক্ষে ১২-ই অগ্রহায়ণ কবি 'বলাকা'র ৩৮নং ও ১৩ই অগ্রহায়ণ ৩৯নং কবিতা টি লেখেন। এরপর কবি শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসেন কিন্তু পৌষ উৎসবের জন্য শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। ৭ই ফাল্গুন শিলাইদহে বসে কবি ৪০নং ও ৮ই ফাল্গুন ৪১ - ৪২ নম্বর কবিতাটি লেখেন। এরপর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে ২৯শে ফাল্গুন 'বলাকা'র ৪৩ নম্বর ও ৪ঠা চৈত্র ৪৪ নং কবিতা লিখলেন।

□ শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসব এল। কবির মন ও হংসবলাকার মতো কোথায় যেন যাওয়ার জন্য চঞ্চল। ৭ই বৈশাখ তিনি কলকাতায় ফিরে 'বলাকা'র শেষ কবিতাটি ৪৫নং (নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতাটি লিখলেন।

প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সবুজের অভিযান' বের হল। তিনি 'কাঁচা', 'সবুজ', 'অবুঝ', 'দুরন্ত', 'জীবন্ত', 'প্রাণ', প্রমত্ত', 'চিরযৌবনা' বলে নবীনকে চিরপ্রচলিত অন্ধ-কুসংস্কারের খাঁচা ভেঙে ফেলার জন্য আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এক প্রবল শক্তিশালী নতুন সুর ধ্বনিত হল। যা সমগ্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক প্রবল শক্তিশালী নতুনসুর বলে পাঠক মহলে মহা ঢেউ উঠে পড়ে গেল।

এই নতুন সুর হল - 'বলাকার সুর'। প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা অনন্ত গতিবেগ বর্তমান. এই চলমান গতিপ্রবাহের মধ্যে মানবজীবনের চরম সত্য নিহিত। এদের যিনি অধীশ্বর তিনি ও লীলায় মত্ত হয়ে ছুটে চলেছেন। পরিবর্তন ও এগিয়ে যাওয়া হল - সৃষ্টির সত্যরূপ। এই পরিবর্তনে বাধা দিলে সৃষ্টি ও পঙ্গুতায় মৃত্যু আসবে। পরিবর্তন ও নতুনত্বকে বরণ করাই হল - জীবনের অস্তিত্বের পরিচয়। 'বলাকায়' কবির এই নতুন ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। 'বলাকায়' কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাবধারা লক্ষ করা যায়:—

(ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি লক্ষ করা যায় — 'ছবি', 'শাজাহান', 'চঞ্চলা', 'বলাকা', প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে।

(খ) মানবজীবনের গতির অনুভূতি, গতির প্রতীক, এবং গতিময়তা জীবন ও যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। 'সবুজের অভিযান (১নং)', 'শঙ্খ', ঝড়ের খেয়া, নববর্ষের আশীর্বাদ প্রভৃতি কবিতায়।

(গ) ভগবানের লীলা হৃদয়ের অনুভূতি কথা বলতে পারি, 'প্রেমের প্রকাশ', 'তুমি-আমি', (২নং), 'মানসী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে।

(ক) — কবি অনুভব করেছেন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। বিশ্বের কোনোকিছুই স্থির নয়, প্রতি মুহূর্তে তার রূপান্তর ঘটছে। প্রত্যেক বস্তুর একটা গতি আছে, গতিই মূল সত্যরূপ। অনন্তকাল অস্থির প্রবাহে ছুটে চলেছে। বিশ্বের সৃষ্টি টিকাতে সৃষ্টি করে। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস, দেশ-ক্ষণান্তরে, রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই গতিস্রোত অবিরাম ভাবে ছুটে চলেছে। এটি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যাকারের রূপ। এই তত্ত্ব কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের মধ্য দিয়ে অপূর্ব কাব্যরূপ নির্মাণ করেছে। 'ছবি' 'শাহজাহান' 'চঞ্চলা' 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে।

(খ) কোনো এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়ে মৃত পত্নীর ছবি দেখে কবির মনে যে ভাবনা চিন্তা ও আবেগের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন তাই ব্যক্ত করেছেন 'ছবি' কবিতায়। কবি পত্নী আজ অচল ছবিতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু জীবিতকালে তিনি ই ছিলেন একান্ত প্রিয় জীবনসঙ্গিনী। একসাথে পথে হেঁটেছেন। নিত্যচলের সাথী তাল রেখে তাঁর প্রিয় জনার পথে ঘুরে ঘুরে ছন্দে ছন্দায়িত হয়েছে। কবির জীবনে তিনি-ই বড় সত্য ছিলেন। তার মাধুর্যের মধ্য দিয়ে কবি বিশ্বকে সুন্দর চেয়েছিলেন। বিশ্বের আনন্দ বার্তাকে তিনি বাণীরূপে কবির কাছে বহন করে এনেছিলেন।

(গ) দুজনে একসাথে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু, মৃত্যুতে কবি পত্নীর যাত্রা থেমে গেল। কবি একাই জীবনপথে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রতিমুহূর্তে নানা পরিবর্তন ও ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আজও তিনি চলেছেন। কিন্তু পত্নী চিরদিনের মতো থেমে নিশ্চল হয়ে একেবারে 'ছবি' হয়ে রয়ে গেলেন। :—

অজানার স্রোতে
চলেছি দূর হতে দূরে
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, — ওই তারা, ওই শশী রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

এই পর্যন্ত এসে কবির চিন্তাধারা অন্যদিকে মোড় নিল। প্রথমে কবি বলেছিলেন – চলমান সৃষ্টির মধ্যে 'ছবি'-ই অচল, গতিশীলতার মধ্যে তাই চিরস্থির, কিন্তু এখন কবি বলছেন – তাঁর এ ভাবনা ভুল, তাঁর পত্নী রেখার সীমায় তো চিত্রপটের মতো আবদ্ধ হয়ে নেই। তার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ মূর্তি ফুটে উঠেছিল, সেই আনন্দ তো চিরন্তন, সে নতুন নতুন ভঙ্গিতে চিরকাল ধরে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কবি তাঁকে চোখে দেখতে না পেয়ে ভুলে গিয়েছিলেন, সে ভুল তো বাইরের প্রত্যক্ষ চেতনায় ~~[illegible]~~ ক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলেও তিনি হৃদয়ের গভীর মগ্নচৈতন্য থেকে কবির মানসভাব, সৌন্দর্য চেতনা ও কবিত্ব শক্তির প্রেরণা যোগিয়েছে। সুতরাং কবির পত্নী আর ছবি নন মাত্র, তিনি [illegible] [illegible] শক্তি।

কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছো স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?

- - - - - - - - - - -

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছো বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।

- - - - - - - - - - -

ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছো যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

"বলাকা" কাব্যগ্রন্থের সাত সংখ্যক কবিতা হল - "শা-জাহান"।

কবিতাটি প্রথম ১৩২১ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় অগ্রহায়ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি কালধারার সুমধুর গতিকে অবলম্বন করে কবি শা-জাহানের প্রেম ভাবনায় পরিচয় দিয়েছেন। আমরা জানি মমতাজের স্মৃতি উদ্দেশ্যে শাজাহানের নির্মিত তাজমহল বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য। মমতাজের প্রতি তার প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শাজাহানের অন্যতম প্রয়াস। যার সৌন্দর্য আজও বিশ্ববাসীর মনকে মুগ্ধ করে।

☐ কবিতায় প্রথমে কবি কালের প্রবহমানতা কে স্বীকার করেছেন। কবি সেইসঙ্গে মহাকালের অসীম ক্ষমতার কথা ও স্বীকার করেছেন। কবি বলেছেন। এই মহাবিশ্বে কোনো কিছু-ই চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছু-ই মহাকালের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। মহাকালের গর্ভে একদিন তলিয়ে যাবে। তাই কবি বলেছেন :—

"এ কথা জানিতে তুমি, ভারত ঈশ্বর শা-জাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।"

☐ "শাজাহান" কবিতায় এমনই এক সত্যকে তুলে ধরেছেন। যা চিরন্তন। চলার পথে সমস্ত কিছু-ই পেছনে ফেলে যেতে হয়। এমন কী প্রেমকে ও। কিন্তু প্রেমিক হৃদয় তার প্রেমকে চিরকালীন রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সম্রাট শাজাহান ও তাই কালস্রোত কে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার অন্তর্বেদনাকে চিরকালীন রূপ তাজমহল নির্মান করেছিলেন

তাঁর হৃদয় নিঙড়ানো অশ্রুলোকের একবিন্দু অশ্রু, যেন অপূর্ব সৌন্দর্য্য মণ্ডিত হয়ে তাজমহলের মধ্যে শোভা পায়, এটা ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু যুগ যুগান্তের তাজমহল একদিন ক্ষীণ হবে। উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হৃদয় তা অনুধাবন করতে পারেনি, এখানেই সম্রাটের ভ্রান্তি। কিন্তু শাজাহানের প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

◫ মানুষ মাত্রেই চিরন্তন পথ চলার পথিক। সময়কে আঁকড়ে ধরে কোথাও স্থির থাকার উপায় নেই। জন্ম - জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কেবল সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এক জীবনের ধন, মান, যশ, সবই সেই জীবনে পড়ে থাকে। জীবনের মহাযাত্রাকালে তাকে শূন্য হাতে আবার পরবর্তী জীবনের প্রবেশ করতে হয়। জীবনের সমস্ত কিছু পিছু পড়ে থাকে। মানুষ কেবল সম্মুখ পথ ধরে এগিয়ে চলে পিছন ফিরে তাকাবার অবসর মানুষ পায় না। তাই কবি বলেছেন :—

"হায় ওরে মানবহৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাহি যে সময়
নাহি নাহি।"

অর্থাৎ, চলমানতাই জীবনের আসল ধর্ম। 'বলাকা' কাব্যের অন্যান্য কবিতায় যে কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

◫ তাজমহল যেন সম্রাট শাজাহানের নতুন মেঘদূত। প্রেম - বিরহের অপূর্ব স্মৃতি, কালিদাসের মেঘদূতের দূত ছিল মেঘ, শাজাহানের

নব মেঘদূতের দূত হল - তাজমহলের সৌন্দর্য। মেঘ যেমন যক্ষের বেদনা বার্তাকে যক্ষপ্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল তেমনই তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্য ও দূতের মতোই শা-জাহানের বাণী কে নীরবে বহন করে চলেছে।

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাহি প্রিয়া',

ঘ) কালের প্রবহমানতায় সমস্ত কিছু, পিছু পড়ে থাকে। যশ ও খ্যাতি অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলে। প্রেম - ভালোবাসা - স্নেহ মায়া - মমতা - সমস্ত কিছু-ই পেছনে পড়ে থাকে। এ কবিতায় কবি গতিময়তার কথা স্বীকার করে শাহজাহানের অপূর্ব প্রেম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। 'বলাকা' কাব্যের মূল ভাবনার সঙ্গে এখানেই মিল। আলোচ্য কবিতায় কেন্দ্রীয় ভাবনার কয়েকটি পংক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা শিল্প সৌন্দর্যের দিক থেকে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যথা—

"তোমার কীর্তির চেয়ে, তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।"

গতি-ই জীবন। যেখানে থামা মৃত্যুর আগমন। এই গতিবাদের কথাই বলাকা কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে আলোচ্য এই কবিতাটি সবুজপত্র পত্রিকায় 'চঞ্চলা' নামে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য কবিতায় কবি গতি ও জীবন তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। জগৎ ও জীবনের গতিময়তাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

☐ কবিতার প্রথমেই কবি বলেছেন, বিরাট নদী অবিরল অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। এই ভরা নদীর স্রোত আপাত দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। কিন্তু তার সেই দ্রুত বেগ বোঝা যায় নদীর উপর ভাসমান ফেনাপুঞ্জের গতি দেখে। জলের বেগে যেমন ফেনার উৎপত্তি তেমনি কালের প্রবাহের বেগ ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। নদীর সাথে বিশ্বজগৎ সমতুল্য। কবি নদীর সঙ্গে বিশ্বপ্রবাহকে তুলনা করেছেন গতিময়তাকে বোঝানোর জন্য।

☐ এরপর কবি নদীকে নারীরূপে কল্পনা করেছেন। কখনো ভৈরবী, কখনো বৈরাগিনী শব্দহীন সুরে নিরুদ্দেশ এর পানে তার পথচলা। কবি বিশ্ব গতিপ্রবাহকে কল্পনা করেছেন প্রিয়তমের দিকে এগিয়ে চলার অভিসারিকা নারীর চিত্রকল্পে। প্রিয়তমের আবেগ বিহ্বল ডাকে এই নদী অন্তহীন দূরে ধাবমান। কবি বলেছেন।

"উন্মত্ত সে অভিসারে
বক্ষ হারে
ঘন ঘন লাগে দোলা — ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মনি"।

☐ এরপর কবি বলেছেন নদীর ধর্মই হল বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলা। এগিয়ে চলাই নদী, অনুকালে কখনোই আর পিছনের মুহূর্তে ফিরে আসতে পারবে না। পথ চলার বিপুল আনন্দে মৃত্যু-জন্ম বহতে বহতে এগিয়ে চলে। গতিপ্রবাহের জন্যই নদী সর্বদা নির্মল গতির প্রবহমানতায় সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে দেয়। বিশ্বচলৎ প্রবহমানতার জন্যই সকল ও আবর্জনা মুক্ত। কখনোই তা বাধা করা যায় না। এই বিশ্বচলৎ যখন পরিপূর্ণ তখনই সে নিঃস্ব। ক্ষীণতার ও অবসান। এই ক্ষীণতা আবার পূর্ণতার সংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর দ্বারা ক্ষীণতা ও আবর্জনার অপসারণ যদি না ঘটত তাহলে বিশ্বজীবনতায় পরিপূর্ণ থাকত। কবি বলেছেন —

"যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তাই তুমি
পবিত্র সদাই"।

☐ কবিতার দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব-প্রবাহের সঙ্গে কবিআত্মার চঞ্চলতার কথা ফুটে উঠেছে। যা কবি নাড়ীতে নাড়ীতে অনুভব করতে পারেন। বিশ্বনটী কবিকে যে ছন্দ সৃষ্টি করেছে, তার ফলেই কবি মানস কোলাহল পেছনে ফেলে সামনের দিকে চলেছে। দূর হতে দূরে। প্রাণ হতে প্রাণে কবিতার শেষে কবি বলেছেন —

"সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে"।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ৩৬ নং কবিতা হল - 'বলাকা'। এটি নাম কবিতা বলাকা কাব্যের মূলভাবনা হল — গতিবাদ। 'বলাকা' কবিতায় কবির উড্ডীয়মান হংস বলাকার গতির মধ্যে তাঁর নিজের, বিশ্বজগতের গতিময়তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতাটি রচনার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট আছে। কোনো এক সন্ধ্যায় কবি কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপর হাউসবোটের উপর কবি বসেছিলেন। চারিদিকে তখন নিস্তব্ধ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এমনই সময় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একদল হংসবলাকা কবির মাথার উপর দিয়ে আপন ছন্দে উড়ে গেল। তা দেখে কবি প্রাণ শিহরিত হয়ে উঠল। কবির মনে হল — ওই হংস বলাকার পাখা যেন পৃথিবীর সমস্ত নিশ্চলের মধ্যে এনে দিল বেগের উতলা।
কবি লিখেছেন:—

"মনে হল এ পাখার বাণী
আনি দিল
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ"।

কবির মনে হয়েছে ওই উড্ডীয়মান বলাকা শ্রেণী যেন পৃথিবীর সমস্ত নিশ্চল পদার্থের মধ্যে বেগের আবেগ এনে দিয়েছে। তাই পর্বত যেন বৈশাখের মেঘের মতোই উড়ে যেতে উদ্গ্রীব। তরুশ্রেণী যেন মাটির বন্ধন থেকে বলাকার শব্দ অনুসরণ করে দিশেহারা হয়ে আকাশের শেষ প্রান্তে অনন্ত উড়ে যেতে চেয়েছে। বলাকার পাখা যেন সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে গতির সঞ্চার করেছে। এনেছে সুদূরের আহ্বান:—

"বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হোথা নয়, অন্যকোন খানে"।

☐ হংসবলাকা যেন ঘুচিয়ে দিয়েছে কবির অন্তরের স্তব্ধতা। কবি তাই অনুভব করেছেন। জলে স্থলে বলাকার পাখার মতোই উন্মত্ততা, চঞ্চলতা, মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত বীজগুলি ও বলাকার মতোই অঙ্কুরের ডানা মেলতে শুরু করেছে। দীপ হতে দীপান্তরে, কবির আপন অন্তরে এই বিশ্বমানবের গতিময়তাকে ও অনুভব করেছেন যথা —

" শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে "
অস্পষ্ট অতীত হতে 'অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে"।

☐ আলোচ্য 'বলাকা' কবিতায় কবি বলাকার মতোই বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি অনুভব করেছেন। সমস্ত জড়তা মুক্ত হতে চেয়েছে। বিশ্বের কোনোকিছু-ই থেমে থাকে না। থেমে থাকতে চায়ও না। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, এক অবস্থা থেকে অন্য নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন - ও বিবর্তনের ~~সুর~~ দিয়ে বলাকা কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে।

☑ "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা হিসাবে কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "বলাকা" কথায় অর্থ হল — উড্ডীয়মান বকের শ্রেণি। গতিশীলতাই যার মূল বৈশিষ্ট্য। এ কাব্যে সেই গতিবাদের কথাই ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়।

(খ)

রবীন্দ্র কাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল – 'বলাকা'। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা হল ৪৫। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন 'বলাকা'য় কবিতাগুলি রচনা করেন। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হল – "সবুজের অভিযান"।

☐ কবিতাটি দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীক। নবীন যৌবনের প্রতীক। এই যৌবনের ধর্মই হল – সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে হেলায় তুচ্ছ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। এই নবীনেরা কোনো শাস্ত্র বিধি বিধান মানে না। কবি সেই সবুজ নবীনদের সাদরে আহ্বান জানিয়েছেন যারা প্রাচীন সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ প্রায় আধমরা, নবীনেরা তাদের ঘা মেরে, অর্থাৎ ভোরের কাকলির দ্বারা সজাগ করে তুলবে তাই কবি বলেছেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"।

☐ এই কবিতায় কবি সেই উদ্দাম যৌবনশক্তিকে, চিরসবুজদের 'নবীন' 'কাঁচা', 'অবুঝ', 'জীবন্ত', 'অশান্ত', 'প্রচণ্ড', 'প্রমত্ত', 'অমর' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। কবি মনে করেন প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারের জালে আবদ্ধ। তাদের প্রাণশক্তির একান্ত অভাব। তবুও তারাই আবার নিজেদের পাকা, অভিজ্ঞ বলে দাবি করে। কবি বলেছেন এরা চোখ কান কুসংস্কারের আবরণে ঢেকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো অন্ধকারের বদ্ধ খাঁচায় বসে ঝিমোচ্ছে।

ওদের জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কবি নবীনদের আহ্বান জানিয়েছেন।

"চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমোয় যেন চিত্রপটে আঁকা।
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচা।
আয় জীবন্ত আয়রে আমার কাঁচা"।

কবির বিশ্বাস, ঝড়ের মতো প্রচণ্ড উন্মাদনায় যৌবনশক্তি যখন এগিয়ে আসবে। তখন প্রাচীন পন্থীদের সমস্ত ভুলগুলো ভেঙে যাবে।

□ এই কবিতায় কবি নবীনদের প্রাণের উচ্ছ্বাস কে স্বাগত জানিয়েছেন। এরা ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে যায় সমস্ত প্রাচীন প্রতিবন্ধকতা কে এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দেবে। এরা সর্বদাই আত্মশক্তিতে নির্ভর করে জানা থেকে অজানার দেশে পাড়ি দেয়। পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নবীনেরা কখনোই নির্ভর করে না। বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নবীনেরা সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত থাকে।

□ কবিতার শেষের স্তবকে কবি নবীনদের 'চিরযুবা', 'চিরজীবী' বলে সম্বোধন করেছেন। চির নবীনদের মধ্যে রয়েছে। চিরযৌবন যা জরার জীর্ণতাকে মুছে ফেলে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ছড়িয়ে দেবে।

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণজরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রান অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি"।

☐ কবিতাটিতে আবেগের প্রাচুর্য বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র কবিতার মধ্যে যৌবনের প্রমত্ত বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে, কবিতার মধ্যে একটা উন্মত্ততা এবং উন্মাদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতায় কবি স্থিতিশীলতার পরিবর্তে গতিশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এগিয়ে চলাই হল জীবনের ধর্ম। নবীনদের সম্মুখে সে কথাই আলোচ্য কবিতায় প্রতিপাদিত হয়েছে।

☐ 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি সর্বগ্রাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। বিধ্বংসী যুদ্ধে মৃত্যুর কলরোল শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যুর তীব্র আর্তনাদ যা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলছে। যুদ্ধ অনেক দূরে সংঘটিত হচ্ছে বলে ভারতীয়দের চুপ করে উদাসীন ভাবে বসে থাকা চলবে না। সকলকে জীর্ণ প্রথাবদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করে নতুন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। যুদ্ধের জন্য আত্মত্যাগে অগ্রসর হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে সফলতায় নতুন জীবনের জন্য। কবি বলেছেন —

"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

☐ এই যুদ্ধের জন্য সকলেই দায়ী। ভীরুর ভীরুতা, উদ্ধত প্রবলের অন্যায় অত্যাচার, লোভীর লোভ, বঞ্চিতের বেদনা, পুঞ্জীভূত হয়ে পৃথিবীতে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন সত্য নিষ্ঠা সাধনা। মায়ের অশ্রু, প্রিয়ার ব্যাকুলতা, গৃহের আরাম সবকিছু উপেক্ষা করে চরম দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত হলে-ই কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

বিপদ সংকুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার নামই হল – "ঝড়ের খেয়া"। থেমে থাকা নয়, এগিয়ে চলাই জীবন। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কবি নবসৃষ্টিকে প্রত্যাশা করেছেন এ কবিতায়, মৃত্যু, ধ্বংস, হত্যা, এ কবিতায় শেষ কথা নয়, সত্য শিব সুন্দরের মহিমাই এ কবিতার শেষ কথা।

ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে ও এ কবিতায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মাঝ সমুদ্রের কান্ডারী যেমন ঝড়-তুফানের সময় জীবনকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে – তেমনই জীবন সমুদ্রের প্রতিটি মানুষ লক্ষ্যে এগিয়ে চলার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। ওই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন মানবতারই জয়ধ্বনি ঘোষিত হবে। কবির বিশ্বাস বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, কখনোই বৃথা হবে না। কবির কঠোর তপস্যায় দ্বারা-ই নূতন দিনের সূর্য উদিত হবে। সেইসঙ্গে কবির বিশ্বাস মানুষ মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে দেবতার অমর মহিমায় উত্তীর্ণ হবে। কবি তাই শেষে বলেছেন :—

"মানুষ চুকিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

গীতালির কবি ও ভগবানের লীলা — রহস্যের অনুভূতি করেছেন তা আমরা দেখতে পাই কাব্যটায়। এটা এক নূতন বৃত্তির রূপ বলে মনে হয়। খেয়া — গীতাঞ্জলির প্রতীক্ষা ও বিরহের কান্না নেই, গীতিমাল্য ও গীতালির মিলনের আনন্দ ও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কবি এখন ~~তাঁকে~~ প্রিয়তমার মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে তার সম্বন্ধের সত্যরূপ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর প্রিয়তম যে তাঁর একান্ত আপনার, কবির মধ্যে কামনায় তাঁর স্থান যে তার প্রিয়তমের ঊর্ধ্বে, এই সৃষ্টিলীলায় তিনি যে একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এ বিষয়ে ~~কিন্তু~~ কোনো সন্দেহ নেই।

☐ 'প্রেমের প্রয়োজন' কবিতায় কবি বলেছেন - যতক্ষণ কবি এই ধরণীকে ভালোবাসেনি, ততক্ষণ আকাশ, সূর্য - চন্দ্র - গ্রহ - নক্ষত্রের দীপ জ্বেলে প্রতীক্ষা করেছিল। কখন তার প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা তার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করবে। কবি যখন ধরণীকে ভালোবাসলেন, তখন তাঁর প্রেমের চিরন্তন আনন্দ গ্রহ-নক্ষত্র-তারায় আলোয় চিরন্তন হয়ে রইল। আকাশ তার সার্থকতা লাভ করল। ধরণী তার পরিপূর্ণতা লাভ করল। তিনি না ভালোবাসলে ~~এ ভুবন~~ এ ভুবন আত্মার পরিপূর্ণতা লাভ করত না।

☐ 'তুমি - আমি' কবিতায় কবি বলেছেন যে, ভগবান কবিকে সৃষ্টি করবার আগে তার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। কবিকে সৃষ্টি ~~করবার~~ করার মধ্যে ভগবানের সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠল। কবির মধ্যে বিশ্বের প্রকাশ হল। আলোর ফুল ফুটে উঠল। তাঁকে চিত্তে পরিতৃপ্ত করে দিয়ে ভগবান তাকে নবরূপে রূপান্তর করে দিয়ে গেলেন। কবিকে পেয়ে তাঁর বুক ভরিয়া উঠল। তাঁকে দেখার জন্য ভগবান স্বয়ং তারায় আলো জ্বাললেন। কবির জন্যই বিশ্ব সত্য হয়ে উঠল। দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতের লীলা সার্থক হল। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের আত্মোপলব্ধি হল।

যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে হয়নি তোমার দেখা
....

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুন ভরা আনন্দ।
জীবন - মরণ - তুফান - তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো [illegible] এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

এটি মানুষ - ভগবানের লীলার চরমতর রূপ। কবি 'কোথায়' লীলাতত্ত্বের শেষ উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন।

মুক্তক ছন্দ :-

প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত, অনিয়মিত ও অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি সম্বলিত চরণান্তিক মিলযুক্ত, রবীন্দ্রসৃষ্ট যে ছন্দ - বন্ধে ভাবটি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় তাকে 'মুক্তকছন্দ' বা 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ বলে

মুক্তক ছন্দের ব্যবহার :-

i) 'মুক্তবন্ধ' বা 'মুক্তকের' পঙ্‌ক্তি বা চরণের পর্বগুলি অসম মাত্রার হয়

ii) 'মুক্তক' ছন্দে পঙ্‌ক্তি - প্রান্তিক মিত্রাক্ষর আছে।

iii) রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তক' গুলি প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত।

iv) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'মুক্তক' গুলি মাত্রা গণনা পদ্ধতি হল - সকল মুক্ত অক্ষর, এবং শব্দের আদি এবং মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর - ১ মাত্রা, একক রুদ্ধ বা শব্দের শেষে রুদ্ধ অক্ষর - 2 মাত্রা

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' মুক্তক ছন্দের প্রসঙ্গ :-

রবীন্দ্রনাথের বলাকা র ছন্দকে ছন্দাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'মুক্তক' নাম দিয়েছেন। এই নামকরণের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। 'মুক্তক' শব্দের অর্থ হল - যে ছন্দ প্রচলিত নানা ধরনের ছন্দের বিবিধ বন্ধন থেকে মুক্ত। 'বলাকা' কাব্যের আগে সনাতন বাংলা ছন্দে এমন কি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে ও চরণের দৈর্ঘ্য ছিল ৮+৬ =১৪ মাত্রায়। কিন্তু মুক্তক ছন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করে তাঁর খুশিমতো চরণ সৃষ্টি করেছেন।

মুক্তকের চরণ ২ মাত্রার। বৃহত্তম পঙ্‌ক্তি ১৮ মাত্রার। দু'একটি স্থানে 22 মাত্রার পঙ্‌ক্তিও আছে। অবশ্য এই ছন্দের পঙ্‌ক্তি মাত্রেই চরণ নয়। এইরকম পঙ্‌ক্তি সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র নিষ্ফল কামনায় দেখা গিয়েছিল।

ii) মুক্তবন্ধ বা মুক্তকের পঙ্‌ক্তি বা চরণের পর্বগুলি অসম মাত্রার, তবে এক এক পর্বের মাত্রা 2, ৪, ৬, ৮, ১০, হয়। মুক্তকের পর্বের মাত্রাসংখ্যা সব সময়ে জোড় মাত্রার হয়, কখনোই বিজোড় মাত্রার দেখা যায় না।

iii) ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা 'মুক্তক' ছন্দে দেখা যায়। এখানে যতি ছেদ বা পর্বচ্ছেদ কতমাত্রায় পরে পরে পড়বে তার কোনো নিয়ম নেই। তবে এই স্বাধীনতার জন্যই ভাবটি একাধিক পঙ্‌ক্তিতে ইচ্ছামতো প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য এই প্রবহমানতা মধুসূদনের সৃষ্টি; তবে মুক্তকে প্রবহমানতা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর থেকেও বেশি যেমন:—

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য দিলে
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে ~~তুমি~~ -ই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি

iv) 'মুক্তক পঙ্‌ক্তি - প্রান্তিক মিত্রাক্ষর আছে তবে, তা নতুন।' উদাহরণগুলি আর এমনি 'বলাকার' সকল মুক্তক-ই মিত্রাক্ষর মুক্ত। অবশ্য অন্যত্র 'অমিত্র মুক্তক' ও আছে। যেমন — 'প্রশ্ন' প্রভৃতি।

'বলাকার' 'ছবি', 'শাজাহান', 'চঞ্চলা', 'উপহার' 'বিচার' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে মুক্তক ছন্দের প্রকার শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে, রবীন্দ্র কাব্যজীবনের গতিপ্রেমময় কাব্য - 'বলাকা', 'বলাকা' কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলি দিক আমাদের চোখে পড়ে - যেমন 'বলাকা' কাব্যের মূলত গতিবাদের কথাকে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে। যেমন:- 'সবুজের অভিযান' কবিতায় নবীনদের এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা ভেঙে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলার কথা বলেছেন। 'ছবি' কবিতায় ছবিকে আপাত দৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা স্থির নয়, বরং কবি এই ছবির মধ্যে কবি গতির সঞ্চার করেছেন, কারণ এই ছবি কবির চেতনালোককে সুদূরপ্রসারী করে তুলেছে, এই ভাবেই গতির কথা প্রাধান্য পেয়েছে 'বলাকা' কাব্যে বিভিন্ন কবিতায়।

গ্রন্থপঞ্জী

i) রবীন্দ্রনাথের বলাকা → ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রকাশক → ৫৬/১৭, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০.০০৯

প্রথম মুদ্রণ → জানুয়ারি, ২০১৬

ii) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা → নীহাররঞ্জন রায়।

গ্রন্থপ্রকাশ → নিউ এজ পাবলিশার্স

কলকাতা → ৭০০০০৯

ষষ্ঠ মুদ্রণ → ২৫ বৈশাখ ১৪১৬

iii) রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা → উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক → ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০০৭৩

একাদশ সংস্করণ :- ২২শে শ্রাবণ ১৪২২।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। এছাড়াও স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভাবনা।

শ্রাবনী ঢালা
- - - - - - - - -
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

EXAMINED
শ্যামল মাইতি 2/7/23 (External)
- - - - - - - - -
নির্দেশক/পরীক্ষকের স্বাক্ষর

DS
Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya